শতবর্ষে নজরুল
ফিরে দেখা

সম্পাদনা
বিষ্ণু বসু ■ আবদুর রউফ

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন,
কলকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিকা

যে কোনো সাহিত্যিক বা শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গি কেমন করে গড়ে ওঠে? দৃষ্টিভঙ্গি বলতে এখানে বোঝান হচ্ছে জীবনকে দেখার, জগৎ-সংসারকে বিচার করার ধরনটাকে। যেটাকে দৃষ্টিকোণ, বিশ্বদৃষ্টি ইত্যাদি অনেক কিছুই বলা যায়। জীবন সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া যখন থেকে শুরু হয় সেই প্রারম্ভিক পর্বটা সাধারণত কারও সচেতন নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে না। এই পর্বে সাহিত্যিকের জীবনদৃষ্টির মৌলচরিত্র নির্ধারণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তিনি সমাজের যে স্তরে জন্মেছেন সেই জন্মগত অবস্থানটি।

কাজী নজরুল ইসলাম জন্মেছিলেন সমাজের তেমন একটা স্তরে যেটাকে বিত্তজনিত মাপকাঠির বিচারে বলা যায় নিঃস্ব বা সর্বহারা শ্রেণীর মানুষের স্তর। আক্ষরিক অর্থে নিঃস্ব বলতে যা বোঝায় শৈশবে এবং কৈশোরে কবিকে তেমন জীবনই যাপন করতে হয়েছিল। জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণে কবির এরকম একটা আর্থ-সামাজিক অবস্থানের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। সত্যি কথা বলতে কী, এরকম একটা আর্থ-সামাজিক অবস্থানের কারণেই নজরুলের সঙ্গে তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য কবি সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য নির্ধারিত হয়েছিল। অন্যান্য কবি-সাহিত্যিক বলতে এখানে যাঁদের কথা বলা হচ্ছে তাঁদের সবাই হয়তো বিত্তবান ছিলেন না, কিন্তু একথাও ঠিক, তাঁদের কাউকেই তাঁদের শৈশব এবং কৈশোর, এমনকী যৌবনেরও একটা বিরাট অংশ নজরুলের মতো কপর্দকশূন্যতাজনিত অপরিসীম ক্লেশের মধ্যে অতিবাহিত করতে হয়নি। এই সীমাহীন দারিদ্র্য যে তাঁর জীবনদৃষ্টিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল—একথা কবি স্বীকার করেছেন অসঙ্কোচে।

কবির মতে 'অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস', 'উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি, বাণী ক্ষুরধার', ইত্যাদি সবই তিনি অর্জন করেছেন দারিদ্র্যের কারণে। দারিদ্র্য তাঁর জীবনের অঙ্গ হওয়ায় 'বিনয়ের ব্যভিচার'-কে তিনি কখনও প্রশ্রয় দিতে পারেননি। যার ফলে গোর্কিকে উদ্ধৃত করে উদ্ধত ভঙ্গিতে অনায়াসেই তিনি বলতে পারেন, 'আমরা কেবল দুঃখ-বেদনার জয়গান গেয়েই নিরস্ত হবো না, আমরা এর প্রতিশোধ নেব; রক্তে নাইয়ে অশুচি পৃথিবীকে শুচি করে তুলব।' সীমাহীন দারিদ্র্যের কারণেই নজরুল ম্যাক্সিম গোর্কির সঙ্গে যতটা সমগোত্রীয়তা অনুভব করেছিলেন সেটা স্বদেশের সমসাময়িক কোন সাহিত্যিকের সঙ্গে অনুভব করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। গোর্কির মতো আর্থ-সামাজিক অবস্থান থেকে দুনিয়াকে দেখার ফলে তাঁর পর্যবেক্ষণ এবং উপলব্ধির জায়গাগুলো ভিন্ন ধরনের মাত্রা পেয়েছিল। গরিব মানুষের বেদনা বোঝার জন্য তাঁকে চেষ্টাকৃত বুদ্ধির কসরত দেখাতে হয়নি। সারাদিন না খেতে পেলে ক্ষুধাতুর শিশুর কচি পেটে কীরকম আগুন জ্বলে সেটা উপলব্ধি করার জন্য এই কবিকে অভিজ্ঞতার বাইরে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়নি। তাই কল্পনা করে নয়, 'দেখিয়া শুনিয়া' তিনি 'ক্ষেপিয়া' যান এবং নিজের 'রক্ত লেখায়' তাদের 'সর্বনাশ' লেখার জন্য দৃঢ়সংকল্প হয়ে ওঠেন যারা 'কাড়িয়া খায় তেত্রিশ কোটির মুখের গ্রাস'। নজরুলের আর্থ-সামাজিক অবস্থানটা গোর্কির মতো না হলে সংকল্পের এই দৃঢ়তা প্রকাশ পেত কিনা সন্দেহ।

আর্থ-সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে দরিদ্র এবং লোকায়ত মানুষের প্রতিভূ হওয়ায় কবি নজরুল আর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। যে মিশ্র

সংস্কৃতি ছিল তাঁর সৃষ্টির অন্যতম প্রধান চরিত্র সেটা তাঁকে কসরত করে আয়ত্ত করতে হয়নি। বাংলার গ্রামে গ্রামে দরিদ্র মানুষদের মধ্যে লোকায়ত সংস্কৃতির যে অনুশীলন আবহমান কাল ধরে প্রচলিত ছিল মধ্যযুগ থেকে কালের অনিবার্য নিয়মে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত অংশগ্রহণের কারণে সেই লোকায়ত সংস্কৃতি মিশ্র সংস্কৃতিরও আকর হয়ে উঠতে থাকে। গ্রামীণ দরিদ্র মানুষদের স্তরে শৈশব এবং কৈশোর অতিবাহিত করার কারণে নজরুলের কবি-মন পুষ্ট হয়েছিল এই মিশ্র সংস্কৃতির ধারায়। তিনি ধনী কিংবা মধ্যবিত্ত ঘরে জন্মালে এটা সম্ভব হত না। কারণ যে সময়টায় তাঁর কবি-মনের বিকাশ ঘটছিল তখন সমাজের এই স্তরের মানুষের মনে চলছিল হয় হিন্দু পুনর্জাগরণ নয়তো মুসলিম পুনর্জাগরণ নিয়ে ব্যাপক আলোড়ন। মিশ্র সংস্কৃতির ব্যাপারটা তাদের কাছে ক্রমেই পরিত্যাজ্য হয়ে উঠছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিত্তশালী হিন্দু এবং মুসলমানদের মনে বিচ্ছিন্নতার বীজ বপন করা হচ্ছিল। এটা করা হচ্ছিল মূলত অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কারণে। একদিকে ধর্মীয় পুনর্জাগরণ অপরদিকে এই ধরনের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রয়াসের ফলে সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতার বীজ বপনকারী ধ্যান-ধারণা বাংলার বিত্তশালী, নগরায়িত, শিক্ষিত মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল অনিবার্য নিয়তির মতো। ঠিক এই রকম সময়টায় শহর থেকে দূরে গ্রামীণ বিত্তহীন মানুষদের স্তরে অবস্থানের কারণে, এবং নগরসংস্কৃতি তখনও গ্রামের লোকায়ত সংস্কৃতিকে হঠিয়ে দিতে পারেনি বলেই উল্লিখিত বিচ্ছিন্নতাবাদী ধ্যান-ধারণা থেকে নজরুলের মন যথেষ্ট পরিমাণে মুক্ত ছিল। মুক্ত ছিল বলেই তিনি বাংলার মিশ্র সংস্কৃতির লোকায়ত ধারাকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বইয়ে দিতে পেরেছিলেন প্রবল বেগে এবং নাগরিক অর্থে অশিক্ষিত পটুত্বের অত্যাশ্চর্য মুনশিয়ানায়। যদিও লোকায়ত শিক্ষার গভীরতা তাঁর ছিল যথেষ্ট পরিমাণেই।

গ্রামীণ বিত্তহীন মানুষদের স্তর থেকে উঠে আসার ফলে বিত্তবান নগরায়িত মানুষদের স্ববিরোধিতা, ভণ্ডামি ইত্যাদিও নজরুলের মনকে বিশেষ স্পর্শ করতে পারেনি। যে কারণে যে কোনো রকম ভণ্ডামির বিরুদ্ধে নজরুলের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ছিল লোকায়ত ধারার ঐতিহ্যবাহী চাঁচাছোলা এবং তীক্ষ্ণ। তাঁর এহেন তীক্ষ্ণ বিদ্রুপের দু-একটা লাইন এখানে স্মরণ করা যেতে পারে—'.....প্রায় 'হাফ'-নেতা হয়ে উঠেছিস, এবার এ দাঁও ফসকালে / 'ফুল'-নেতা আর হবি নে যে হায় / বক্তৃতা দিতে কাঁদিতে সভায় / গুঁড়ায়ে লঙ্কা পকেটেতে বোকা এই বেলা ঢোকা! / সেই তালে নিস তোর ফুটো ঘরটাও ছেয়ে, নয় পস্তাবি শেষকালে।' নজরুলকাব্যে এ ধরনের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের নজির রয়েছে ভূরি ভূরি। বিত্তের অস্তিত্বজনিত মানসিক জটিলতা না থাকায় নজরুলের মন সবরকম ভণ্ডামি থেকে মুক্ত ছিল বলেই এ ধরনের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ তাঁর লেখনীমুখ থেকে বেরিয়ে আসত সাবলীল গতিতে।

কেবলমাত্র ব্যঙ্গ-বিদ্রুপই নয়, নিজের একান্ত নিভৃত অনুভূতিগুলিকেও তিনি প্রকাশ করতেন স্পষ্ট অর্থবোধক শব্দাবলী প্রয়োগের মাধ্যমে। আলঙ্করিক শব্দ প্রয়োগ করে নিজের আত্মপ্রকাশের ভাষায় আলো-আঁধারির কুহেলিকা সৃষ্টি তাঁর একেবারেই পছন্দ ছিল না। অথচ শিক্ষিত নগরায়িত মানুষ সাহিত্যে স্পষ্ট ভাষণ তেমন পছন্দ করেন না। আলো-আঁধারির কুহেলিকাই তাঁদের বেশি পছন্দ। এইসব সংস্কৃতায়িত বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবী ভাষা ব্যবহার এবং আঙ্গিক নির্মাণের উৎকর্ষ বিচারের যে মান নির্ধারণ করেছেন, সেই মাপকাঠি

নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নজরুল কোনো দিনই অনুভব করেননি। ফলে তাঁর বাকভঙ্গি উল্লিখিত সংস্কৃতায়িত মানুষদের কাছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে শ্রুতিকটু, এমনকী অপাঠ্য বলেও প্রতিভাত হয়েছে। তিনি যখন গেয়ে ওঠেন, 'জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াত খেলছ জুয়া।/ ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয়ত মোয়া।'— এরকম নিরাভরণ স্পষ্টোক্তির যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিয়েও সংস্কৃতায়িত অগ্রণী বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ একে কবিতা বলতে রাজি হননি। কিন্তু যাঁরা সংস্কৃতায়িত নন, যাঁদের মানসিকতা বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বহন করে তাঁদের হৃদয়ের কাছে এই স্পষ্টোক্তির আবেদন অব্যর্থ।

কিন্তু যাঁদের কাছে নজরুলের নিরাভরণ প্রকাশভঙ্গির আবেদন অব্যর্থ তাঁদের বেশির-ভাগই নগরায়িত বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবীদের বাগাড়ম্বরের সামনে নিজেদের ভালোলাগার সপক্ষে যুক্তিবিস্তারে অক্ষম। কারণ লোকায়ত সংস্কৃতির এইসব উত্তরাধিকারীর আত্মপ্রত্যয় তেমন জোরালো নয়। জোরালো নয় বলেই সংস্কৃতায়িত বুদ্ধিজীবীরা কাব্যবিচার, ভাষাশৈলীর উৎকর্ষ বিচার ইত্যাদি যে মাপকঠি নির্ধারণ করেছেন, সেটাকেই তাঁরা আদর্শ বলে শিরোধার্য করেন। ফলে এইসব শিকড়হীন বুদ্ধিজীবী যখন নজরুলকে যথেষ্ট পরিশীলিত এবং সংস্কৃতায়িত নয় বলে উপেক্ষা করেন, নজরুল অনুরাগীদের মধ্যে তাঁর যথোচিত জবাব দেওয়ার মতো বিশেষ কাউকেই খুঁজে পাওয়া যায় না। ফলে শতবর্ষে পৌঁছেও নজরুলের একপেশে মূল্যায়ন হয়। অধিকাংশ নগরায়িত বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবীর বিচারে বাংলার এই জনপ্রিয়তম কবির পক্ষে প্রথমশ্রেণীর সাহিত্যিকের মর্যাদাপ্রাপ্তি কিছুতেই সম্ভব হয় না।

উল্লিখিত শিকড়হীন নগরায়িত উন্নাসিক বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই অবশ্য নজরুলের অসামান্য জনপ্রিয়তার কথা খেয়ালে রেখে তাঁদের উপেক্ষার মনোভাবটা সরাসরি ব্যক্ত করেন না। এক্ষেত্রেও তাঁদের আচরণে তাঁদের মজ্জাগত ভণ্ডামি বিশেষভাবে প্রকটিত হয়। নজরুল শতবার্ষিকী উপলক্ষে আহূত সভাসমিতিতে প্রকাশ্যে তাঁরা কবির উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই করেন। কিন্তু নিজেদের ঘনিষ্ঠ সার্কেলে নজরুলকে তাঁরা দ্বিতীয় শ্রেণীর কবির বেশি মর্যাদা দিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করেন। তাঁদের এই কুণ্ঠার মধ্যে নিহিত রয়েছে জাতি হিসাবে বাঙালির আইডেনটিটি সংকটের প্রকৃত স্বরূপটি।

বাঙালির আইডেনটিটি সংকটের বর্তমান চেহারাটা দানা বাঁধতে শুরু করেছিল এদেশে ইংরেজ আগমন এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকেই। তার আগে পর্যন্ত বাঙালি জীবনে লোকায়ত সংস্কৃতিরই প্রাবল্য ছিল। উচ্চবর্ণের বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে সংস্কৃতায়ণের যতটুকু প্রভাব ছিল তা বাঙালি সংস্কৃতির মূল ধারায় তেমন কিছু হেরফের ঘটাতে পারেনি। বাঙালির মধ্যে হিন্দু এবং মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান সমান থাকায় এখানকার লোকায়ত সংস্কৃতি ছিল মূলত মিশ্র সংস্কৃতি। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়টায় মুসলমানদের মধ্যে একধরনের শুদ্ধি আন্দোলন বিস্তার লাভ করেছিল ঠিকই, (পূর্ববাংলার যেটি ফারাজি এবং পশ্চিমবাংলায় ওয়াহাবি আন্দোলন নামে পরিচিতি লাভ করেছিল) কিন্তু তার দ্বারা বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতির মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার মতো কোনো কারণ ঘটেনি।

সেটা ঘটেছিল কলকাতাকে কেন্দ্র করে ইংরেজ প্রবর্তিত পাশ্চাত্য শিক্ষার বিচিত্র

অভিঘাতে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবেই শিক্ষিত বাঙালি প্রথম জাতীয়তাবাদের নতুন ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে অভিহিত হয়। এদেশে এই নবীন ধ্যান-ধারণার প্রয়োগ ঘটাতে গিয়ে জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হিসাবে তাঁরা অবলম্বন করেন হিন্দু পুনর্জাগরণবাদকে। এক্ষেত্রে খেয়াল রাখা দরকার প্রথম প্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠেছিল কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু বাঙালিরাই। তাঁদের মধ্যে যাঁরা সেকুলার ধ্যান-ধারণার অনুসারী হয়ে উঠেছিলেন কালক্রমে তাঁদের সংখ্যা হয়ে পড়ে নিতান্তই মুষ্টিমেয়। হিন্দু পুনর্জাগরণবাদীরাই জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা হয়ে ওঠায় মুসলমান বাঙালিদের উপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে। হিন্দুদের তুলনায় কিছুটা বিলম্বে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানদের জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা প্যান ইসলামের আদর্শকে অবলম্বন করেই স্ফূর্তি লাভ করে। ফলে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি মানসিকতায় জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করে স্পষ্টতই বিভাজন রেখা ফুটে ওঠে। যে বিভাজন রেখা বাঙালির গ্রামীণ লোকায়ত সংস্কৃতিতে দুর্লক্ষ্য ছিল।

কেবলমাত্র হিন্দু কিংবা মুসলিম পুনর্জাগরণবাদী জাতীয়তাবাদের প্রশ্নেই নয়, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়, কাব্য-সাহিত্যচর্চায় কলকাতাকেন্দ্রিক আধুনিক বাঙালি পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণাকে এমনভাবে রপ্ত করে যে পূর্বপুরুষদের দ্বারা চর্চিত মিশ্র সংস্কৃতি এবং লোকায়ত জীবনচর্যার সঙ্গে তাদের পুরোপুরি বিচ্ছেদ ঘটে যায়। ফলে কলকাতাকেন্দ্রিক বেশিরভাগ বুদ্ধিজীবীই হয়ে পড়েন শিকড়হীন। কাজী নজরুল ইসলামের এই দুর্দশা ঘটেনি। তাই গ্রাম এবং শহর, হিন্দু এবং মুসলমান সর্বস্তরের বাঙালির হৃদয় তিনি জয় করতে পেরেছিলেন। যদিও কলকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীদের বেশির ভাগই শুরু থেকেই যে তাঁর সৃষ্টিসম্ভার সম্পর্কে কিছুটা উন্নাসিকতা এবং অবজ্ঞামিশ্রিত মনোভাব পোষণ করতেন—একথাও নজরুলের জনপ্রিয়তার মতোই সমান সত্য।

এরকম মনোভাবের কারণ, আবহমান কালের গ্রামীণ, লোকায়ত সংস্কৃতির উত্তরাধিকারের সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালির সম্পর্কহীনতা। ধর্মীয় পুনর্জাগরণবাদী হওয়া সত্ত্বেও এই উত্তরাধিকারকে আপন বলে গ্রহণ করার কথা তাঁদের কখনও মনে হয়নি। মনে হলে অবশ্য পুনর্জাগরণবাদী ধ্যান-ধারণা চর্চা করতে করতে ধর্মীয় মৌলবাদী হয়ে ওঠা তাদের পক্ষে কোনো দিনই সম্ভব হত না। নজরুলের কবিমানসের পরিচয় নিতে গেলে এই কথাটাই নতুন করে অনুধাবন না করে উপায় থাকে না।

হিন্দু কিংবা মুসলিম পুনর্জাগরণবাদ যে নজরুলমানসকে আলোড়িত করেনি এমন নয়। এর পাশাপাশি পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা তাঁকে যথেষ্ট পরিমাণেই প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু এসবই তিনি গ্রহণ করেছিলেন বাঙালির লোকায়ত সংস্কৃতির জারক রসে জারিয়ে নিয়ে। ফলে তাঁর কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সবার জন্যেই জাগরণের মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল, তেমন জাগরণের জন্য ধর্মীয় ঐতিহ্য গর্বের প্রসঙ্গ টেনে আনতেও তিনি কসুর করেননি। কিন্তু সেই জাগরণের মন্ত্র কখনই বিচ্ছিন্নতাবাদের মন্ত্রণায় রূপান্তরিত হতে পারেনি। কারণ বাঙালির লোকায়ত সংস্কৃতিচর্চার উত্তরাধিকার হিসাবে প্রাপ্ত মিশ্র সংস্কৃতির বুনিয়াদটাকে অস্বীকার করে হিন্দু কিংবা মুসলিম পুনর্জাগরণবাদ নজরুলের কাব্যে কখনও উচ্চারিত হয়নি। নজরুলমানসে লোকসংস্কৃতির এই বুনিয়াদটা দৃঢ়মূল ছিল বলেই অতিরিক্ত

সংস্কৃতায়ণের কবলে পড়ে কিংবা পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার আত্মীকরণের বাড়াবাড়ির দ্বারা তিনি কখনও বেশি দূরে সরে যাননি। নজরুলের অসামান্য জনপ্রিয়তার মূলে তাঁর মানসলোকের এই ঐতিহাসিক অবস্থানটি ছিল বেশি কার্যকারী।

এখনকার পাঠকদের পক্ষে নজরুলের এ ধরনের মানসিকতার প্রকৃতি অনুধাবন করা খুবই কঠিন। কারণ গ্রামীণ লোকায়ত বাঙালি সংস্কৃতির ধারাটি এখন বিশুষ্কপ্রায়। কি গ্রাম, কি শহর সর্বত্রই এখন নাগরিক সংস্কৃতির দাপট। যে সংস্কৃতি এমন কতকগুলি বিষয়ের জগাখিচুড়ি যাতে আর যাই-ই থাক, লোকায়ত সংস্কৃতির সমন্বয়বাদী সুরটি একেবারেই অনুপস্থিত। এই নাগরিক সংস্কৃতিতে রয়েছে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তা এবং ইংরেজিতে অপরিপক্ক আমজনতা সম্পর্কে উন্নাসিকতা। যাঁরা পাশ্চাত্যের বদলে স্বদেশিয়ানার অনুরাগী সেইসব বাঙালি ভদ্রলোক কোনো না কোনো ভাবে ধর্মীয় মৌলবাদের অনুসারী। ফলে হয় তারা আধুনিকতার মিশেল দেওয়া হিন্দু নয়তো ওইরকমই মুসলমান। নাগরিক বাঙালি ভদ্রলোকদের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিই গ্রামের তথাকথিত শিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত মানুষেরাও প্রাণপণে অনুকরণের চেষ্টা করে থাকে। ফলে গ্রামীণ লোকায়ত সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বহনকারী বাঙালি ভদ্রলোক এখন খুঁজে পাওয়া মুশকিল। হয়তো অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে তাঁদের অস্তিত্ব একেবারে মুছে যায়নি। কিন্তু নাগরিক সংস্কৃতিকে ধারণ করার ব্যাপারে বাঙালি ভদ্রলোকদের অত্যুৎসাহের কারণে লোকায়ত সংস্কৃতির উত্তরাধিকারীর অস্তিত্ব নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো আগ্রহ তাঁদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে হ্যাঁ লোকসংস্কৃতি নিয়ে গবেষণার ব্যাপারটা ইদানীং নাগরিক সংস্কৃতিরই একটা ফ্যাশন হয়ে ওঠায়, কেউ কেউ এই ফ্যাশনচর্চায় বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠার চেষ্টা করেন। একটা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি হাতানো কিংবা বিদেশভ্রমণের মতো লোভনীয় সুযোগ-সুবিধাও এই ফ্যাশন-চর্চার ফলে সহজলভ্য হয়ে ওঠে।

লোকায়তসংস্কৃতির উত্তরাধিকারের ব্যাপারটাকে নিছক ফ্যাশন হিসাবে চর্চা করেন না এমন ব্যতিক্রমী কেউ কেউ নিশ্চয়ই আছেন। কিন্তু সমাজমানসে তাঁদের প্রভাব ছিল খুবই অকিঞ্চিৎকর। ফলে নজরুলের মধ্যে লোকায়ত সংস্কৃতির উত্তরাধিকারের সঙ্গে আধুনিক ধ্যান-ধারণা মিশ্রিত হয়ে বাঙালি সংস্কৃতির যে সমন্বয়ী স্বরূপ বিকশিত হয়েছিল তার উপযোগিতা নির্ধারণ করার মতো বুদ্ধিজীবী এখন খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তাই নজরুলের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষেও আমরা সেই পুরাতন কথাগুলিরই পুনরাবৃত্তি শুনতে পাই। শুনতে পাই, নজরুল বড্ড বেশি আবেগসর্বস্ব কবি ছিলেন, তিনি যথেষ্ট পরিমাণে সংস্কৃতায়িত ছিলেন না, ফলে তাঁর ভাষা এবং লিখনশৈলী যথাযথভাবে পরিমার্জিত তথা নাগরিক মনের উপযোগী ছিল না। এসবই নজরুল সম্পর্কে চিরায়ত অভিযোগ। ইদানীং অভিযোগগুলিই ক্রমেই বড়ো হয়ে উঠেছে—তাঁর অবদানের দিকটা নিয়ে আলোচনা গুরুত্ব হারিয়ে ফেলছে। বেশিরভাগ বুদ্ধিজীবীই মনে করেন 'যুগের হুজুগ' কেটে যাওয়ার পর নজরুলের অবদান নিয়ে নতুন করে আলোচনার আর কিছুই নেই।

লোকায়ত সংস্কৃতির উত্তরাধিকার নিয়ে যাঁদের মাথাব্যথা নেই, এই উত্তরাধিকারের সঙ্গে আধুনিকতা মিশ্রিত হলে বাঙালির আইডেনটিটির চেহারা কেমন দাঁড়াত, তাতে হিন্দু-মুসলমানের ফারাক বিশেষ থাকত কিনা, তেমন আইডেনটিটি সম্পর্কে সচেতন হলে ধর্মীয় মৌলবাদ বাঙালিকে আদৌ প্রভাবিত করতে পারত কিনা—এসব নিয়ে ভাবনার